দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের নবীকরণের সময় থেকে অধীনস্থ ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির আধিপত্য শুরু হয়। কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভারতের যুক্ত হওয়া এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশে, শিল্পপণ্যের ভোক্তায় এবং একটি পরিবেষ্টিত শিল্প অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বুখারিন বিশ্ব অর্থনীতি বলতে বুঝিয়েছিলেন—"উৎপাদন সম্পর্কের একটি বন্দোবস্ত যা ক্রমে বিশ্বজোড়া বিনিময় সম্পর্কের জন্ম দেয়" (a system of production relations and correspondingly, of exchange relations on a world scale.)। পোলিশ অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যাঞ্জ (Oscar Lange) বিনিময় সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে বোঝাতে গিয়ে লিখেছিলেন—"স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতি ছিল একপেশে, এগুলি কাঁচামাল ও খাদ্য সরবরাহকারী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল। বিদেশি পুঁজি এই দেশগুলি থেকে মুনাফা অর্জন করত তা এদেশগুলিতে পুনর্বিনিয়োগ করা হত না, যে দেশ থেকে পুঁজি এসেছিল, সে দেশেই লভ্যাংশের পুরোটা পাঠিয়ে দেওয়া হত" (The economies of the underdeveloped countries became onesided, raw material and food exporting economies. The profits which were made by foreign capital in these countries were used not for re-investment in these countries but exported back to the countries where the capital came from.)। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল খনিতে, বাগিচায় (Plantation), কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের (Raw material processing) কাজে এবং সাম্রাজ্যিক প্রধান কেন্দ্র (imperial metropolis) দ্বারা পরিবেষ্টিত রপ্তানি শিল্পে। একথাও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল যে, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সুসভ্য একটি সমাজ ভারতকে অধীনস্থ করে রেখেছে। অথচ দেখা যায়, ভারতীয় কৃষি সমাজের উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ছিল অত্যাবশ্যক, কিন্তু ১৮৭৫ সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকার সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিল মাত্র ১.১ কোটি টাকা। ১৯০১ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয় ৭০ লক্ষ টাকা। তুলনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়কালে শিক্ষাখাতে ব্যয় ৮০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১.৪ কোটি টাকা। এই অধ্যায়ে ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের বিষয়টি আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

১২.১ কৃষির বাণিজ্যিকরণ

কৃষির বাণিজ্যিকরণ বলতে কেবলমাত্র কৃষিজ উৎপাদনের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হওয়া বা নগদ টাকার জন্য কৃষিজ উৎপাদন বোঝায় না। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেও চাষের ফসলের বাজার

Scanned with CamScanner

ছিল। কিন্তু তার জন্য ভারতীয় কৃষিতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আসেনি। বাণিজ্যিকরণ কথাটি আরও অনেক বেশি অর্থবহ। বাণিজ্যিকরণ বলতে বোঝায়, কৃষকের স্বেচ্ছায় বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া, জমির বাজার ও কৃষিপণ্যের বাজারের বিকাশ এবং কৃষকের স্তরবিন্যাস। এ সমস্ত কিছুরই পরিণতি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন। একথা অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে কৃষকরা মূল্যের ওঠানামায় এবং বাজারের চাহিদায় সাড়া দিয়েছিল। কৃষক সত্যিই বাজারের চাহিদার দিকে তাকিয়ে এক ফসলের পরিবর্তে অন্য ফসল ফলাতে আগ্রহী হয়েছিল কিনা বিষয়টি কিছুটা অবান্তর। কারণ কৃষকরা অনেকগুলি স্তরে বিভক্ত ছিলেন এবং খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় তাঁরা ছিলেন না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি মূল্যের তারতম্য হ্রাস করেছিল ঠিকই, কিন্তু তা সমস্ত স্তরের কৃষকদের মধ্যে একইরকম প্রভাব ফেলেনি। মাইকেল ম্যাক্‌আলপিন (Michelle McAlpin) লিখেছেন—উর্ধ্বদেশের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির খাদ্যশস্যের মূল্য ১৯০০ সালের আগে নির্ধারণ করত বন্দর শহরগুলির সঙ্গে পরিচালিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য। বিশ শতকের প্রথম দশকে পরিবহন ও পরিকাঠামোর উন্নতির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রধান কৃষি পণ্যগুলির একটি অভ্যন্তরীণ জাতীয় বাজার গঠিত হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের কৃষিতে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলি এনেছিল তার ফলে ঐতিহ্যগত গণ্ডিবদ্ধ সম্পত্তির অধিকার পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অপ্রতিহত ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই নতুন অধিকারের দ্বারা লাভবান ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক তারতম্য ছিল। সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব চাহিদা এবং খাজনা বৃদ্ধির বিষয়ে জমিদারদের ওপর আইনি নিয়ন্ত্রণের অভাব কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ করে তুলেছিল। মোগল আমলেও রাজস্বের হার বাড়ানো হত এবং কৃষকরা অনেক সময়ই জায়গিরদার, ইজারাদার ও জমিদারদের দ্বারা নির্যাতিত হতেন, কিন্তু মানুষ ও জমির অনুকূল আনুপাতিক হার (favourable land-man ratio) রাজস্ব বা খাজনা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রিত করত। কৃষকদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়া বা জমির বাজারের বিকাশ সে যুগে ঘটেনি। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন মোগল যুগেও কৃষিপণ্য বাজারে আসত। মোগল যুগের অন্তিমলগ্নে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ রাজস্ব ফসলের পরিবর্তে নগদ টাকায় এবং মোট উৎপাদনের তুলনায় আরও বেশি হারে আদায় করা শুরু হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতক থেকে যেভাবে কৃষিপণ্যের বাজার তৈরি হল তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমত, পরিমাণগত পার্থক্য অর্থাৎ মোট উৎপাদনের অনেকটা বাজারে আসতে থাকে এবং দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতায় ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের চাহিদা ভারতের কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ আমলে রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত চাহিদা কৃষকদের বাজারমুখী করে তোলে। রাজস্ব ও খাজনার চাহিদা মেটাতে হত নগদ টাকায়। অথচ কৃষকদের কাছে নগদ টাকার

Scanned with CamScanner

ঘাটতি ছিল। তাই পণ্যের বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া বীজ, কৃষি সরঞ্জাম, গবাদি পশু ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের প্রায়ই ঋণ নিতে হত। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে শস্য বাণিজ্যের সঙ্গে ঋণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ আসত পণ্যের মাধ্যমে। হুইটকোম্ব (Whitcombe) এবং শাহিদ আমীন দেখিয়েছেন, বাধ্যতামূলকভাবে নগদ টাকায় রাজস্ব বা খাজনা দেওয়ার জন্য কৃষকরা প্রায়ই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তেন। খাজনা মেটানো ও ঋণ পরিশোধের তাগিদ কৃষকদের জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিকরণের (Forced Commercialisation) দিকে নিয়ে যায়। ইরফান হাবিব বলেছেন, এখানেও মোগল যুগের থেকে ব্রিটিশ যুগের এক বড়োসড়ো বিচ্যুতি চোখে পড়ে। খাদ্য-শস্যের অনুপাতে অর্থকরী শস্যের (Cash crop) আবাদ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য-শস্যের (Food crop) ফলন কমে যায়। আবহাওয়া, জমির বিশেষত্ব ও পরিবেশ অনুযায়ী ভারতের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের অর্থকরী শস্যের চাষ শুরু হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মোট যত একর জমিতে আখ চাষ হত তার ৫৩.৪ শতাংশ ও ২৭.৮৪ শতাংশ যথাক্রমে যুক্তপ্রদেশে ও বাংলায় চাষ হত। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে গম চাষের হার ছিল যথাক্রমে ৩৫.২৪ শতাংশ, ২৫.৩ শতাংশ ও ১০.৩ শতাংশ। মাদ্রাজে ৭৭.৩ শতাংশ চীনাবাদাম উৎপন্ন হত। বম্বে, বেরার ও হায়দ্রাবাদে তুলা চাষের হার ছিল যথাক্রমে ৩০.৮৮ শতাংশ, ১৫.৮৫ শতাংশ ও ১৩.৯৪ শতাংশ। ধান ও পাট চাষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল বাংলা। ১৯৩০-৩১ সাল নাগাদ বাংলার মোট আবাদি জমির ৭২.৫ শতাংশ জমিতে ধান চাষ ও ১০.৭ শতাংশ জমিতে পাট চাষ হত। ব্রিটিশ আইন জমিকে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং জমি বন্ধকি রেখে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। এই নতুন বিকাশ চাষিদের অর্থকরী শস্য ফলানোর প্রতি মনোযোগী করে তোলে। কৃষ্ণা ভরদ্বাজ বলেছেন—"জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিকরণের পরিণতি হিসাবেই চাষিদের কিছু অংশ ক্রমশ পণ্যায়নের পথে গিয়েছিলেন" (The increasing commoditization was for some sections of the peasantry a consequence of forced commercialisation.)। অধ্যাপিকা ভরদ্বাজ আরও বলেছেন—পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, ঔপনিবেশিক সরকারের চাপ, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির জালে প্রান্তিক দেশগুলির অন্তর্ভুক্তি, ঔপনিবেশিক রাজস্ব ও বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয়গুলি কৃষির বাণিজ্যিকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

১২.১.১ উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত

পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের অনগ্রসর এলাকাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিতে বাণিজ্যিকরণ শুরু হয়েছিল। এই চাপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত চাহিদা, স্বল্প বৃষ্টিপাতের দরুন ফসলের অনিশ্চয়তা, অনুর্বর জমি এবং অনুন্নত সেচ ব্যবস্থা। বাণিজ্য ও মহাজনী কারবার সম্মিলিতভাবে এই অঞ্চলে দাদনি ব্যবস্থার মতো একটি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। কিন্তু মধ্য পাঞ্জাবের অবস্থা এরকম ছিল না,

Scanned with CamScanner

খরচ করেছিল। সরকারের সেচ প্রকল্প ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজেই নিয়োজিত হয়েছিল। যে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলোর চাহিদা কমে গেল, সে মুহূর্তে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে জল সম্পদ বিকাশের উদ্যোগে সরকারি নিস্পৃহতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উত্তর ভারতে দেখা গেল, ভালো বর্ষার বছরগুলিতে কেবলমাত্র গম, আখ, বার্লি ইত্যাদি লাভজনক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সেচ ব্যবস্থা সীমিত রাখা হয়েছিল। সেচকৃত এলাকাগুলি থেকেই সরকার সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় শোলাপুর জেলায় রাজস্বের হার ছিল একর প্রতি চার আনা। কিন্তু ১৮৮১-৮২ সাল নাগাদ এক্রুর হ্রদ তৈরি হওয়ার পর রাজস্বের হার দাঁড়ায় একর প্রতি চার টাকা। উইলকক্স (Willcocks) বলেছেন—বাংলাতে যদিও ১৮৭৫ সালে জামালপুর খাল এবং ১৮৮১ সালে ইডেন খাল কাটা হয়েছিল, তবুও এখানে সেচকৃত কৃষিজমির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। ১৯০০ সালে সেচ কমিশন (Irrigation Commission) তার প্রতিবেদনে লিখেছিল—ব্রিটিশ ভারতে ২২৬ মিলিয়ন একর আবাদি জমির মধ্যে মাত্র ৪৪ একর আবাদি জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছিল। তার মধ্যে ৬০ শতাংশ সেচের কাজই হয়েছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে। স্থানীয় কুয়া বা পুকুর থেকে কৃষিক্ষেত্রে জলের ব্যবস্থা করা হত। সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা সেচ প্রকল্পের ফলে সার্বিকভাবে কৃষির উন্নতি হলেও কতগুলি অসুবিধাও এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, ছোটো চাষি অধ্যুষিত কৃষিক্ষেত্রগুলিতে সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বৃহৎ সেচ প্রকল্পের চেয়ে বেসরকারি সেচ ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারের আয় বাড়ানো, কৃষির অগ্রগতি বা সম্প্রসারণ নয়। তৃতীয়ত, বহু ক্ষেত্রেই পরিকল্পনাবিহীন সেচ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কৃষি এলাকাই লবণাক্ত হয়ে পড়েছিল এবং অনেক জমি শুষ্ক ঊষর ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

১২.৬ সম্পদের নির্গমন

১৮৪২-৪৩ সাল থেকে ভারতে আমদানির তুলনায় ভারত থেকে রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের নির্গমন তত্ত্ব (Drain theory) উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। থিওডোর মরিসন (Theodore Morrison) হিসাব করে দেখিয়েছেন—১৯০০ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে ভারত থেকে বছরে গড়ে ১৫,০৫১,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড মূল্যের সম্পদের নির্গমন হয়েছিল। দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত সম্পদের নির্গমন (Drain of Wealth)-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯০০ সালের ১২ অক্টোবর দাদাভাই নৌরজি লর্ড হ্যামিল্টনকে লেখা এক চিঠিতে জানান—ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলি, সামরিক পদগুলি এবং লাভজনক বাণিজ্য-সংস্থাগুলি ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে গেছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের যা আয় তা ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের এক-ষষ্ঠাংশ। তাছাড়া জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ করেন যে, বিদেশের অর্থাৎ ব্রিটেনে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য

Scanned with CamScanner

ভারত সরকার মোটা টাকা ব্যয় করত, যা Home Charges নামে পরিচিত ছিল। রপ্তানি করে ভারতের স্টার্লিং-এ যে নিট আয় হত, তা আর এদেশে ফেরত আসত না।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, ১৮৬০-৬৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড ভারতের জন্য বছরে গড়ে ৯.৪ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড খরচ করত। ১৮৬৬-৭০ সালের মধ্যে এই বার্ষিক গড় দাঁড়ায় ৯.৫ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারত থেকে 'হোমচার্জ' বাবদ পাঠানো টাকার পরিমাণ ২.৬ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড থেকে অনেকটাই বেড়ে হয়েছিল ২৫.৮ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। ১৮৪০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারত থেকে ইংল্যান্ডে পাঠানো 'হোমচার্জ' ছিল মোট ভারতীয় রাজস্বের ১০ শতাংশ। ১৮৫৭ সালের পর এই হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির প্রাথমিক তথা প্রধান কারণ ছিল—১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনের খরচা ব্রিটিশরাজ ভারতীয়দের কাছ থেকে তুলে নিতে চেয়েছিল। ১৮৪০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বার্ষিক হোমচার্জ-এর পরিমাণ ছিল ৩৩৫ স্টার্লিং পাউন্ড। কোম্পানি শাসনাধীনে ভারত থেকে ব্রিটেনে 'হোমচার্জ' বাবদ বছরে ২.৮ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড যেত। কিন্তু মহারানির শাসনে এই পরিমাণ বেড়ে হয় বছরে ৬.৭ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। সামরিক খাতে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ভারত থেকে চলে যেত, বলা বাহুল্য তা ভারতীয় অর্থনীতির কোনো উপকারে লাগেনি। আফগান যুদ্ধ, চীনের আফিম যুদ্ধ, পারস্য যুদ্ধ, আবিসিনীয় যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের পেরাক অভিযান, মিশর যুদ্ধ, সুদান যুদ্ধ, এবং এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক অভিযানের জন্য ব্রিটেনের যে বিপুল ব্যয় হয়েছিল, তার একটা বড়ো অংশই এসেছিল ভারতীয় রাজস্ব থেকে। ১৮৭৮ সাল নাগাদ সামরিক খাতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বাৎসরিক ব্যয় দাঁড়ায় ২৫ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড, যা ছিল ভারতীয় বাজেটের প্রায় ৪১ শতাংশ। অর্থনীতিবিদ ভেরা অ্যানস্টে (Vera Anstey) সম্পদ নির্গমন সংক্রান্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের যুক্তিগুলি মেনে নেননি। কিন্তু তিনি পর্যন্ত স্বীকার করেছেন সামরিক খাতে ভারতীয় সম্পদের খরচ ছিল অন্যায্য। নবেন্দু সেন সঠিকভাবেই বলেছেন—ভারতীয় সম্পদের বহির্গমনের পুরো চিত্র পেতে হলে প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ইউরোপীয় অফিসারদের বেতন, তাদের অবসরকালীন ও ছুটিতে থাকার ভাতা (Pension and furlough allowances) এবং ব্রিটেনে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার খরচ সমস্ত কিছুই হিসাবের মধ্যে আনতে হবে। এই খাতে ১৮৬১-১৮৭৫ সাল পর্যন্ত হোমচার্জের বার্ষিক গড় ছিল ১.১ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। ১৯১০-১১ সাল নাগাদ এই বার্ষিক গড় হয় ২.৪ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। একই সময়ের মধ্যে রেল ও সেচ সংক্রান্ত কাজের জন্য ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত হোমচার্জের বার্ষিক গড় ১০.৩ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড থেকে বেড়ে হয়েছিল ২০.৩ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। রেল কোম্পানির বিনিয়োগকারীদের জন্য চুক্তি মাফিক ৫ শতাংশ সুদের কথা আমরা আগের অংশে আলোচনা করেছি। এই চুক্তি মাফিক সুদ দিতে গিয়ে ১৮৬৯ সালে ভারত সরকারের খরচ হয় ১৫ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড, ১৮৮১ সালে ২৮ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড এবং ১৯০০ সাল নাগাদ এই খরচের পরিমাণ ফুলেফেঁপে দাঁড়ায় ৫১.৫২ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। এই সমস্ত অর্থই ব্রিটেনে চলে যেত

Scanned with CamScanner

এবং তা আসত ভারতীয় করদাতাদের পকেট থেকে। কার্ল মার্কস্ সঠিকভাবেই লিখেছিলেন—"What the English take from them annually in the form of rent, dividends for railways useless to the Hindus ; pensions for military and civil services, for Afganistan and other wars, what they take from them without any equivalent and quite apart from what they appropriate to themselves within India, it amounts to more than the total sum of income of the 60 millions of agricultural and industrial labourers of India. This is a bleeding process with a vengeance." তদুপরি ভারতে উচ্চ বেতনের সমস্ত পদগুলি ছিল ইউরোপীয়দের দখলে। এইভাবেই বেসরকারি খাতে প্রচুর ভারতীয় সম্পদ বিদেশে চলে যেত এবং এর পরিমাণ ভারতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। ভারতীয় সম্পদের বহির্গমনের এই বিষয়টির ওপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ভারতীয় সম্পদের নির্গমন ভারতে এক দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংকটের জন্ম দিয়েছিল।

১২.৭ অবশিল্পায়ন

রেলপথের বিস্তার, রাস্তা তৈরি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। এই বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটেন থেকে তৈরি শিল্পপণ্য আমদানি। কারিগর দ্বারা গ্রামাঞ্চলে তৈরি বিভিন্ন পণ্য যেমন মোটা সুতিকাপড়, রেশমবস্ত্র, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র, চামড়ার জিনিস ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের অবশিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অবশিল্পায়নের যে প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তার বৈশিষ্ট্য ছিল হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের অবক্ষয় এবং তাদের ক্রমশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী দ্বিতীয় পর্যায়ের অবশিল্পায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—অবশিল্পায়নের ফলে অপ্রধান শিল্পগুলিতে (Secondary Industry) নিযুক্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ক্রমশ কমে গেছিল। এই সংজ্ঞার নিরিখে জে. কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন—খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, সুতা, রেশম, পশম ইত্যাদি বস্ত্রের হস্তশিল্প, চামড়া শিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। বিভিন্ন বস্ত্রশিল্প ও চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল ৪,৭৩৫। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা হয় ৪,২৮৪। অর্থাৎ হ্রাসের হার ছিল মাত্র ৯ শতাংশ। কিন্তু ১৮০৯-১৩ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে এই হ্রাসের হার ছিল অনেক বেশি। এই সময়ের মধ্যে পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাহাবাদ, মুঙ্গের এই স্থানগুলিতে কুটির শিল্পে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৯.৫ শতাংশ হারে কমে গিয়েছিল। অমিয় বাগচী পরিসংখ্যান সহকারে দেখিয়েছেন গাঙ্গেয় বিহারে ১৮০৯-১৩ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ অপ্রধান শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০১ সালে নিযুক্ত ছিলেন ১০.৫ শতাংশ।

Scanned with CamScanner

পিটার হারনেট্টি বলেছেন, মধ্যপ্রদেশে কৃষি কাজে এবং জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে বহু তাঁতি নিজেদের পেশা পরিত্যাগ করেন। মধ্যপ্রদেশের প্রশাসনিক প্রতিবেদন (১৮৬৪-৬৫) লিখেছিল—বহু তাঁতি, দিনমজুর হিসাবে কাজ পাওয়ার আশায় কৃষির দিকে ঝুঁকেছিল এবং তুলোর চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতিও ঘটেছিল। আমেদাবাদের কালেক্টর ১৮৬৫ সালের ৩০ মার্চ তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কার্যাবলি যথা—রেলপথ নির্মাণ, রাস্তা তৈরি, খালকাটা ইত্যাদির জন্য শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাঁতিরা এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবন ধারণের একটা বিকল্প ও লাভজনক উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৮৬০ সাল নাগাদ হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত তাঁতির সংখ্যা ছিল ২৮,৬০৪। ১৮৬৩ সালে এই সংখ্যা কমে হয় ১৮,৭৩৫। হ্রাসের হার ছিল ৩৪ শতাংশ।

রাজস্থানের হস্তশিল্পে নিযুক্ত তাঁতিদের সংখ্যা কমে যায়। ১৯১১ সালে রাজস্থানের মোট জনসংখ্যার ১২.৩ শতাংশ হস্তশিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে সেই হার কমে হয় ৮.৫ শতাংশ। রেলপথের বিস্তার সুতাবস্ত্র শিল্প, চর্মশিল্প ও মৃৎশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। পাঞ্জাবে অপ্রধান শিল্পে নিযুক্ত পুরুষ কারিগরের সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল ৫ লক্ষ ৭২ হাজার। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা কমে হয় ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার। হ্রাসের হার ছিল ৩৪ শতাংশের কাছাকাছি। তাঁত, কাঠশিল্প, চর্মশিল্প ইত্যাদিগুলি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ. ভি. রামন রাও লিখেছেন—অন্ধ্র অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি গ্রামীণ জীবনে ও গ্রামীণ শিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। আর. ডি. চোক্‌সি (R. D. Choksey)-এর মতে—পশ্চিম ভারতের সর্বত্র রেলপথের বিস্তার হস্তশিল্পের বিনাশ সাধন করেছিল। মাদ্রাজ অঞ্চলে ২ থেকে ৩ হাজার পরিবার সুতা কাটার কাজে নিযুক্ত ছিল। বিশ শতকের গোড়ায় এই পেশা বন্ধ হয়ে যায়। ইংল্যান্ড থেকে আসা সুতাবস্ত্র এদেশের বাজার ভরিয়ে দেবার ফলে হস্তশিল্পে নিযুক্ত তাঁতিরা তাদের বাজার হারান। তখন দেশি তাঁতিরা সাধারণ গরীব মানুষের ব্যবহার্য মোটা সুতাবস্ত্র তৈরির কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু মন্বন্তর, মন্দা ইত্যাদি নানা কারণেই গরিব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হত। ফলে তাঁতিদের জীবনেও সংকট নেমে আসে।

১৯১১ সালের বাংলার আদমশুমার (Census) তৈরি করতে গিয়ে ও'ডোনেল আক্ষেপ করেছিলেন—"ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আসা প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁত শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অথচ সেই শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য বা সংরক্ষণ শুল্ক (Protective tariff) ও সক্রিয় রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিকল্প কোনো শিল্প গড়ে তোলা হয়নি" (Much of the weaving industry has suffered from the competition of Lancashire, yet nothing has been done to revive the industry or to replace it by other industries through protective tariff and active state aid)। এন. এন. ব্যানার্জী তাঁর *Cotton Fabrics of Bengal*-এ লিখেছেন—ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর ইত্যাদি সামান্য কিছু জায়গায় বিশেষ গুণমানের সুতিকাপড় তৈরি হত সেগুলির চাহিদা তখনও ভালো ছিল। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ মোটা কাপড় ব্যবহার করতেন সেগুলির মূল্যের স্বল্পতা ও স্থায়িত্বের জন্য।

Scanned with CamScanner

কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই কাপড়গুলি তৈরি করা হত যন্ত্রে বোনা সুতো দিয়ে, আর সেগুলি বাংলার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজারেই পাওয়া যেত। ব্যানার্জীর এই প্রতিবেদন থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট—বাংলার সুতোকাটুনিদের (Spinners) একটা বড়ো অংশ কর্মচ্যুত হয়ে পড়েন। আদমশুমার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় ১৮৭২ সালে বাংলার তাঁদের সঙ্গে যুক্ত জনসংখ্যা ছিল ২,৭৮,১৯৭। ১৯২১ সালে তা কমে হয় ১,৮৯,৭৩৬। হ্রাসের হার ছিল ৩১.৭৯ শতাংশ। বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহি, মেদিনীপুর—এই সমস্ত রেশমবস্ত্র প্রস্তুতকারী জেলাগুলিতে ১৯০১ সালে রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ২৩,৯৫৮। ১৯২১ সালে তা কমে হয় মাত্র ৫,২৩২। হ্রাসের হার ছিল ৭৮.১৬ শতাংশ। ভাগলপুর, রাঁচি, সাঁওতাল পরগনা, পালামৌ, হাজারিবাগ, মানভূম ও সিংভূম জেলায় তসর শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ১৯১১-১৯২১ এই ১০ বছরে ৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

অবশিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতির ওপর যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও রানাডের মতো উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদীরা। কিন্তু ড্যানিয়েল থর্নার (Daniel Thorner) বলেছেন—উনিশ শতকের গোড়ায় অবশিল্পায়ন হয়েছিল কিন্তু তারপর ভারতের কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় অবশিল্পায়নের কোনো প্রমাণ নেই। আরও এক ধাপ এগিয়ে মরিস. ডি. মরিস (Morris. D. Morris) বলেছেন—অবশিল্পায়ন মোটেই ভারতে ঘটেনি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বিষয়টির ওপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের উপরোক্ত আলোচনা ও পরিসংখ্যান থর্নার ও মরিসের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে না। মার্কসীয় চিন্তাধারাতেও অবশিল্পায়নের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় মার্কস্ লিখিত প্রবন্ধাবলি থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে রজনী পাম দত্তের *India Today* গ্রন্থে ও তাঁর উত্তরসূরিদের লেখায় অবশিল্পায়ন বা Deindustrialisation বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ও বাম দুই ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ভারতে অবশিল্পায়ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে আবার অবশিল্পায়নের ধারণা ও অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান, যদিও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় এই সন্দেহ অমূলক।

১২.৮ ভারতে শিল্পায়নের ধারা

ভারতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ছিল মূলত রপ্তানি নির্ভর এবং তা সার্বিক আর্থনীতিক উন্নতির সহায়ক হয়নি। বি. আর. টমলিনসন (B. R. Tomlinson) দেখিয়েছেন—১৮৭০ সাল নাগাদ ভারতে বিনিয়োগকৃত ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৬০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। ১৯১৩ সাল নাগাদ তা বেড়ে হয় ৩৮০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। এই বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশই বিনিয়োগ করা হয়েছিল চটশিল্পে, চা বাগিচায়, খনিতে এবং জাহাজ নির্মাণের কাজে। ভারতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, মূলত পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে। ১৯৩১ সাল নাগাদ বস্ত্র কারখানাগুলির দুই-তৃতীয়াংশই গড়ে উঠেছিল বম্বে প্রেসিডেন্সিতে। বিশেষত

Scanned with CamScanner